Downloaded from: justpaste.it/6lwfw

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন

এনজিও গোষ্ঠী ঋণ সাম্রাজ্যের মাধ্যমে অত্যাচার করছে

আবদুল্লাহ আল ফারুক

==========

একি! লর্ড ক্লাইভ সাহেব আপনি আবার এসেছেন?

না। লর্ড ক্লাইভ নয়, তবে এনজিওদের তৎপরতায় লর্ড ক্লাইভের প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে। ক্লাইভের উত্তরসূরীরা যতই সেবার কথা বলুক না ওরা যে আমাদের সেবা করতে আসেনি তা আর কারো বুঝতে বাকী নেই। ওরা এদেশে এসেছে আমাদের সম্পদ লুটতে। তাই সংগঠন করে, ঋণ দিয়ে, ব্যবসা করে যা লুটছে তাতে বোধহয় ওদের পেট ভরছে না। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে পারলে হয়ত একটু মনের মতো লুটপাট করা যেতো। কিন্তু এ যুগে সরাসরি ক্ষমতা দখল করাতো সম্ভব নয়। তবে একটা তাবেদার সরকার কায়েম করতে পারলেও উদ্দেশ্য কিছুটা হাসিল করা যায়। লর্ড ক্লাইভ উপমহাদেশে এসে এই নীতি প্রয়োগ করেই বৃটিশ উপনিবেশ স্থাপনের ভিত্তি স্থাপন করেছিল এবং পরবর্তিতে তার উত্তরসূরীরা সেই নীতি অবলম্বন করেই উপমহাদেশকে গ্রাস করে নেয়। এনজিও গোষ্ঠীও এদেশে তাদের শেকড় মজবুত করে এখন লর্ড ক্লাইভ অনুসৃত কূটনীতির অস্ত্র প্রয়োগে তৎপর হয়েছে। তারা এদেশে এখন একটা বিকল্প তাবেদার সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে তারা সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে এদেশের সকল রাষ্ট্রীয় স্বার্থ বিরোধী ইসলাম বিদ্বেষী চক্রকে সংঘবদ্ধ করছে। ইসলাম বিরোধী রাম বাম রাজনীতিকদের উৎসাহ দিচ্ছে। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন এই এতিম চক্রকে এনজিওতে চাকুরী দিয়ে পূর্ণবাসিত করছে।

তাদের নতুন নতুন এনজিও গঠন করতে সাহায্য করছে। এভাবে ওরা বাম রাজনীতিকদের আর্থিকভাবে শক্তিশালী হতে সাহায্য করছে। বামপন্থী ও রাষ্ট্রবিরোধী চক্রের মাধ্যমে এদেশের অর্থনীতির চাকা নিয়ন্ত্রণ করতে চায় বলে তারা এদের হাতে এনজিও নামক শোষণের যাতাকল তুলে দিচ্ছে। সম্প্রতি এদেশে একটি অন্যতম বামপন্থী দলে ভাঙ্গন ধরেছে কৃষক শাখাকে এনজিওকরণের প্রতিবাদে। ক্লাইভ যেমনি এদেশের ক্ষমতা দখল করার পূর্বে সর্বত্র একটা বিশ্বাসঘাতক চক্রের জন্য দিয়েছিল, তেমনি এনজিও ওয়ালারাও দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাঙ্গণ সহ সর্বত্র মীরজাফর, উর্মিচাদ, রায় দুর্লভ, ঘষেটি বেগম, রাজ ভল্লব, জগৎ সেঠ সৃষ্টির জন্য টাকার বিনিময়ে বুদ্ধিজীবী কর্মকর্তাদের মগজ কিনে নিচ্ছে। এসব বিক্রি হয়ে যাওয়া ভদ্রলোকেরা স্বদেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য নিযুক্ত এবং এদেশের অর্থে লালিত পালিত হলেও এনজিও গোষ্ঠীর নগদ নারায়নের জোরে জাতির দুর্যোগ মুহূর্তে যে এনজিওদের স্বার্থ রক্ষা করে দেশের স্বার্থ ক্ষুন্ন করবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। ইতিমধ্যেই সে লক্ষণ ফুটে উঠেছে। এনজিওরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধণের জন্য নিজেরা পত্রিকা প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হয়নি। তারা সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে বাম পন্থী এবং ইসলাম বিদ্বেষীদের পত্রিকা প্রকাশ করে জনমত গঠনে উৎসাহ যোগাচ্ছে। দেশের ১৪টি দৈনিক পত্রিকা এবং অসংখ্য সাপ্তাহিক, মাসিক এনজিওদের প্রত্যক্ষ অর্থ সাহায্যে চলে বলে ব্যাপক গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। এসব পত্রিকা ইসলামকে মৌলবাদী, সন্ত্রাসবাদী এবং প্রগতি ও বিজ্ঞান বিরোধী বলে প্রমাণ করার জন্য সর্বদা আতঙ্ক উদগীরণ করছে!

ইসলামের বিরুদ্ধে উস্কানী মূলক প্রচারণা চালিয়ে এসব পত্রিকা মুসলমানদের হৃদয়ে আঘাতের পর আঘাত দিয়েই যাচ্ছে। এসব পত্রিকার প্রচার সংখ্যা প্রায় শূন্যের কোঠায়। অথচ এত বিপুল পরিমাণ অর্থ লোকসান দেয়ার পরও এই গরীব দেশে এমন ব্যয় বহুল পত্রিকাগুলো বছরের পর বছর টিকে থাকছে। তাদের এই টিকে থাকার কেরামতি একটু খোজ নিলেই ফাস হয়ে যাবে।

"ঘাদানী" নামক এদেশের সন্ত্রাসবাদী একটা উগ্র রাজনৈতিক চক্রকে সমর্থন দিয়ে এনজিওরা ইতিমধ্যেই তাদের রাজনীতিতে আগমন এবং রাজনৈতিক দর্শনের কথা দেশবাসীর সামনে জাহির করেছে। মূলত এরা চায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় দুর্বল কোন সরকার কায়েম হোক, যাতে বৈদেশিক সাহায্যের অস্ত্র প্রয়োগ করে সে সরকারকে এনজিও গোষ্ঠির নীতি বাস্তবায়নে বাধ্য করা যায়। অথবা দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, জাতীয় ঐক্যকে বিনষ্ট করে দিয়ে অরাজকতা, গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে দিতে। এ জন্যও এনজিওরা কাদিয়ানীদেরকে তাদের ভ্রান্ত ধর্মমত প্রচারে সাহায্য করছে। নিজেরা খৃষ্ট ধর্ম প্রচার করছে। বা প্রচারকদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। ঘাদানি, পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি বাহিনী ও দেশের হিন্দু সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে তাদের রাষ্ট্র বিরোধী তৎপরতায় আরও চাঙ্গা হয়ে ওঠতে সাহস যোগাচ্ছে। সম্প্রতি দৈনিক ইনকিলাব (১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯২) জাতিকে হুসিয়ার করে দিয়ে এনজিওদের ভয়ঙ্কর চক্রান্তের স্বরূপ তুলে ধরে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। তাতে বলা হয়েছেঃ " এনজিও'র উদ্দেশ্য যেহেতু পরিকল্পিত উপায়ে দেশে সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং ইতিহাসকে মুছে দিয়ে একটি নির্দিষ্ট টারগেটের দিকে এদেশের মানুষকে ধাবিত করা, বাংলাদেশের স্বার্থ তাদের কাছে বড় নয়। তাদের কাছে বড় যে কোন কিছুর বিনিময়ে এদেশে খৃস্ট ধর্ম প্রচার করা। আর এজন্য একটি জঙ্গী বাহিনী গড়ে তোলার জন্য তারা এনজিওগুলোর মাধ্যমে এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করেছে। পশ্চিমা এনজিওগুলোর সূচনা ঘটে ক্যাথলিক খৃষ্টান মিশনারীদের দ্বারা।

অনুন্নত, গরীব, নির্যাতিত এবং নিপীড়িত মানুষের মধ্যে কাজ করার এক জঙ্গী কৌশল অবলম্বন করেছে ক্যাথলিক খৃস্টানরা। এনজিওসমূহ পরিচালনার জন্য নির্দেশিকামূলক একটি গ্রন্থ রচনা করা হয়। বইটিন নাম "নির্যাতিতদের জন্য শিক্ষণীয়"। লেখক পাওলো পিরেরী। বইটি এই এনজিও সমূহের জন্য বাইবেল স্বরূপ। বিশ্বের অন্যান্য দেশের যেমন বাংলাদেশেও তেমনি এই গ্রন্থটিই হচ্ছে এনজিও সমূহের এর মূল দর্শন। বইটি রচিত পুরোপুরি মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, বিশ্বের নির্যাতিত নিপীড়িত সর্বহারাদের নিয়ে। কিন্তু গ্রন্থটির কোথাও মার্কসের কোন নাম গন্ধ নেই। ক্যাথলিক খৃস্টানদের উদ্যোগে লিখিত "পেডাগগী অব দ্যা অপরেসড"। এর লক্ষ্য হচ্ছে সর্বহারাদের মধ্যে কাজ করা এবং তাদেরকে শেষ পর্যন্ত খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা। নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষের মনে প্রচণ্ড এক আলোড়ন সৃষ্টি করা তাদের উদ্দেশ্য। ক্যাথলিক পাদ্রীদের এই ষড়যন্ত্রে প্রলুব্ধ হয় বাম চিন্তাধারার লোকেরা। অবশ্য প্রকৃত মার্কসিস্টরা সব সময়ই তাদের বিরোধীতা করছে। বাংলাদেশেও এর কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। বাংলাদেশের তথাকথিত বাম রাজনীতিকরা এবং কর্মীরা কোন না কোনভাবে এখন এনজিওগুলোর সাথে জড়িত হয়ে পরেছে। অবশ্য প্রকৃত বামরা এখনো দারে রেখেছেন নিজেদেরকে। যে জঙ্গী বাহিনী গড়ে তোলা হয় তারা বাম খৃস্টান হিসেবেও পরিচিত। অনেকে মনে করেন, বিশ্বে বাম রাজনীতির বিপর্যয় শুরু হয়"পেডাগগী অব দ্যা অপরেসড" এর শিক্ষার বাস্তবায়ন শুরু হওয়ার পর থেকেই।

বাংলাদেশে কার্যরত অধিকাংশ এনজিওই খ্রিস্টান মিশনারীদের দ্বারা পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষ ভাবে পরিচালিত এবং এসব এনজিওর সব কটির মূলমন্ত্র এবং পরিচালিকা শক্তি হচ্ছে "পেডাগগী অব দ্যা অপরেসড" গ্রন্থটি। তারা ইতিমধ্যে তাদের প্রকল্প এলাকাগুলোতে এক ধরনের বাহিনী গড়ে তুলেছে। কয়েক বছর আগে যশোরে এবং মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায় এ ধরনের বাহিনীর কার্যকলাপ, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের রূপ নেয়। এরপর তারা একটু সাবধানী হয়ে এখন তাদের পরিকল্পনা মাফিক অগ্রসর হচ্ছে। উল্লেখ করা যেতে পারে,

ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে যে তিনটি গ্রুপ রক্তক্ষয়ী সংঘাতে লিপ্ত রয়েছে, “পেডাগগী অব দ্যা অপারেড” এর অনুসারী ক্যাথলিক খৃস্টানরা তার একটি। অপর দুটি গ্রুপ হচ্ছে। (১) ড্রাগ মাফিয়া গ্রুপ এবং (২) মাওপন্থী বামগ্রুপ। আমাদের অতি কাছের দেশ ফিলিপাইনে বর্তমানে কম্যুনিস্টদের নামে যে সংঘাতের কথা প্রচার করা হয়, তাও আসলে এই “পেডাগগা অব দ্যা অপরেসড” এর অনুসারী ক্যাথলিক খৃস্টানদেরই সংঘাত।

বাংলাদেশেও একই ধরনের বাহিনী গড়ে তোলার কাজ পূর্ণোদ্যমে এগিয়ে চলেছে।

এদেশে কার্যরত এনজিওগুলোর কার্যক্রম যেভাবে বাস্তবায়িত করা হচ্ছে তাতে ধীরে ধীরে দেশকে যেন আর এক সংঘাতের পথে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

এনজিওসমূহের প্রকল্প এলাকাগুলোতে রাজনৈতিক কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং যে শিক্ষাক্রম তারা বাস্তবায়ন করছে তাতে সুবিধাভোগীরা ক্রমেই জঙ্গী হয়ে উঠছে। ইসলাম ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রতি মুসলমানদের মধ্যে অনীহা সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জুমার নামাযেও নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। অন্যান্য ওয়াকতের নামায পড়ার সুযোগ তো ঘটেই না। কোন কোন এনজিও প্রকাশ্যে পর্দার বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করেছে।

বাম ও তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী লোকেরা এখন বিপুল সংখ্যায় খৃস্টান ক্যাথলিকদের পাতা ফাঁদে পা দিয়েছে। বেশ কিছু লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে, মার্থ সামাজিক উন্নয়নের কর্মসূচী গৃহীত হচ্ছে। কিছু কিছু লোকের ব্যক্তি উন্নয়নও ঘটছে বিপুল ভাবে। এসব লোক দরিদ্র জনসাধারণকে প্রলুব্ধ করছে এবং পরিকল্পনা মতোই তাদের পরিচালিত করছে ইতি লক্ষ্যের দিকে।”

ঋণ আদায়ে মধ্যযুগীয় বর্বরতা

গ্রামীণ ব্যাঙ্কসহ ঋণদানকারী এনজিওরা বিশেষ করে ব্র্যাক, আশা, গণসাহায্য সংস্থা, প্রশিকা ঋণের নামে এক বর্বর মহাজনী ব্যবসা শুরু করেছে এবং আদায়ের ক্ষেত্রে আগের দিনের জমিদারদের পাইক পেয়াদারা যেভাবে অত্যাচার চালিয়ে খাজনা আদায় করতো একই অমানবিক আচরণ করে বর্তমানে ঋণ আদায় করা হচ্ছে। সম্প্রতি এনজিওদের অজ্ঞাতে সারাদেশে একটি ব্যাপক গবেষণা কাজ চালানো হয়েছে এবং এর ফলাফল লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হবে। সেই গবেষণা কর্মীদের মতে, “অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে মানবাধিকার লংঘিত হয়েছে। দৈহিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। এনজিওদের এসব অত্যাচারের কাহিনী প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ঘটায় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। ফলে এনজিওর ঋণ আদায়ের নামে যে মধ্যযুগীয় বর্বরতা চালিয়েছে তা গোপন থেকে গেছে। অত্যাচারের পর অত্যাচারিতকে নানাভাবে ভয়-ভীতি দেখানো হয়েছে যাতে সে অন্য কোথাও অত্যাচারের কথা প্রকাশ না করে। অত্যাচার ও ভয়-ভীতি প্রদর্শনে গ্রামীন ব্যাঙ্ক সবার সেরা”।

“ঘটনা ময়মনসিংহের। গ্রামীণ ব্যাংক থেকে এক ভূমিহীন ঋণ নেয় ৩ হাজার টাকা, সংস্থার নিয়ম-কানুন অনুযায়ী। নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করছিল। এক সময় ব্যবসায় মন্দা দেখা দেয়ায় কিস্তি পরিশোধ প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। অর্ধাহারে অনাহারে থেকে আরো কয়েক কিস্তি শোধ দেয়ার পর বাকি থাকে প্রায় দু হাজার টাকা। বন্ধ হয়ে যায় কিস্তি দেয়া। টাকার জন্য চাপ দিতে থাকে গ্রামীন ব্যাংক। শুরু হয় পালিয়ে পালিয়ে থাকা। গ্রাপের অন্যরাও অসহায় হয়ে পরে। ঋণদাতা কর্মীকে চাপ দেয় বস। চাকুরিচ্যুতির ভয় দেখায়। কর্মীটি বাধ্য হয়। লোকটির অস্থাবর একমাত্র সম্বল একটি মাঝারি সাইজের গরু ধরে সংস্থার স্থানীয় অফিসে নিয়ে আসে। ৪/৫ দিন চলে যায়। গরুর মালিক ভয়ে আর গরু নিতে আসে না। একদিন সিদ্ধান্ত হয় গরু নিয়ে আবার গ্রামে

যাওয়া হবে, গ্রুপ এবং পাড়ার অন্যান্যদের ডেকে বিষয়টির মীমাংসা করা হবে। শেষে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্রামে নিয়ে গিয়ে গরুটি জবেহ্ করে মাংস ভাগ্য দিয়ে বিক্রি করে মোট ১৬শ' টাকা পাওয়া যায়। আরো বাকি ৪শ' টাকা যোগ করে ২ হাজার টাকা সংস্থায় জমা দিয়ে ঋণমুক্ত করে লোকটিকে এবং সঙ্গে নিজের চাকরিও রক্ষা করে। [সাপ্তাহিক খবরের কাগজ, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩]

ব্যবসা বাণিজ্যে এনজিওঃ

দারিদ্র বিমোচন, জনসেবা এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের চটুল শ্লোগান নিয়ে এনজিওরা এদেশে আগমন করলেও বর্তমানে এনজিওর ব্যবসা বেশ জমজমাট। এনজিও এখন একটা লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। তারা সেবার নাম করে রিয়েল এস্টেটের মলিক হচ্ছে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে এবং জাতীয় অর্থনীতির ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে। ব্র্যাক নামক এনজিও গাজিপুরে ২০ একর জমির ওপর গড়ে তুলেছে তাদের ট্রেনিং সেন্টার। এছাড়া তাদের রয়েছে একটি অত্যাধুনিক প্রেস, আড়ং নামক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং কোল্ড স্টোরেজ, তারা সরকারের কাছে একটি ব্যাংক খোলারও অনুমতি চেয়েছিল। অনুমোদন পেয়ে যাবে বলে শোনা গিয়েছিল। শেষ খবর জানা যায়নি। যেখানে একটি ব্যাংক এবং একটি মাত্র এ্যাকাউন্টের মাধ্যমে প্রাপ্ত সাহায্য নেয়ার নিয়ম এবং অধিকাংশ এনজিও এই নিয়ম মেনে চলছে না সেখানে ব্রাককে আলাদা ব্যাঙ্ক খোলার অনুমতি দেয়ার পরিণতি নিশ্চয় শুভ হবে না। শোনা যায় যে, বড় বড় অধিকাংশ এনজিওই একাধিক এ্যাকাউন্টের মাধ্যমে টাকা নিয়ে থাকে।

প্রশিকা মানবিকের ঢাকা খুলনা রুটে 'দিতি' নামে একটি পরিবহন সংস্থা আছে। কথা ছিল এই পরিবহনের যে লাভ হবে তা সেবার খাতে ব্যয় হবে। সম্প্রতি জানা গেছে যে, এ পরিবহন লোকসান করছে না বিক্রি করে দেয়া হয়েছে, তার কোন হদিস পাওয়া যায় নি। এছাড়া কারিতাসসহ আরো বহু, এনজিও কুটির শিল্পের সাথে জড়িত রয়েছে।

"হিসাব কিতাব ও অডিটের ঝামেলা না থাকায় দেশীয় অনেক কালো টাকা খাটানোর মাধ্যমেও পরিণত হয়েছে এনজিওগুলো। এখানে টাকা খাটালে (অনুদান) তার হিসাব নিজেদের মন মতো করলে চলে। দেশের অনেকে এখন এনজিওদের প্রতি ঝুঁকে পরছে। আর এনজিওর টাকার মালিক সেখানকার কর্তা ব্যক্তিরা। দাতাদেরকে টাকা ফেরত দেয়ার কোনো প্রশ্ন নেই। এই কর্তা ব্যক্তিরা নানা অজুহাতে টাকা নিজের পকেটস্থ করছেন। একটি এনজিওতে হাতে গোনা কয়েকজন কর্তাব্যক্তি থাকেন! এরাই সর্বেসর্বা, নীতি নির্ধারক শহরে, গ্রামে কুটির শিল্প, বিভিন্ন পেশাজীবি শ্রমজীবি গ্রুপ করে যে ঋণ দেয়া হয়, সে ঋণ আবার নানা কিস্তিতে ফিরিয়ে নেয়া হয় সুদের নামে সার্ভিস চার্জসহ। এই যে টাকা ফেরত আসছে এটার মালিক এই কর্তাব্যক্তিরা। এছাড়া ঐ কয়েকজন কর্মকর্তা একাধিক প্রকল্পে কাজ করে ৪০/৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত প্রতি মাসে বেতন হিসাবেই হাতিয়ে নিচ্ছে।"
[সাপ্তাহিক পূর্ণিমা, ২৫শে নভেম্বর, ১৯৯২]

এ সম্পর্কে দৈনিক ইনকিলাব (১৮ই নভেম্বর, ১৯৯৩ সংখ্যা) একটি চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট প্রকাশ করে। সেবা ধর্মের আলখেল্লা পরে ব্রাকের ব্যবসার জাল বিস্তার শিরোণামের রিপোর্টে বলা হয়ঃ "সেবার নামে খুঁটি গেড়ে তারা এখন চুটিয়ে ব্যবসা করছে। সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানের আলখেল্লা তাদের গায়ে-তাই তারা পাচ্ছে ৫ বিভিন্ন সুবিধা। আর এই সুবিধার অপব্যবহার করে তারা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সাথে প্রতিযোগিতায় নামছে। ফলে, মার খাচ্ছে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান। অসুস্থ এই প্রবণতার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও নীরব। বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মোড়কে বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্রাক) নামক এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭২ সালের গোড়ার দিকে

দেশের পূর্বাঞ্চলে জরুরী পূনর্বাসন কার্যক্রমের নামে আত্মপ্রকাশ করে। সংগঠনের সূত্র মতে, এ সংগঠনটি ডায়রিয়া প্রতিষেধক, অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাসহ গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রচেষ্টায় জড়িত। এই কথার পাশাপাশি এটাও সত্য যে, ব্র্যাক নামক সংস্থাটি ধীরে ধীরে তাদের বাণিজ্যের জাল বিস্তার করছে। এই জাল বিস্তারের ভয়াবহ দিকটি হলো, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের অজুহাতে বিভিন্ন পর্যায়ে কর শুল্কের রেয়াত গ্রহণ করে তারা সরাসরি প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্যে নেমেছে। এতে সত্যিকারের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো, যারা দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী কর শুল্ক পরিশোধ করে ব্যবসা করছে, অসম প্রতিযোগিতায় ক্রমশ পিছু হঠছে। এতে করে একদিকে যেমন এসব প্রতিষ্ঠান অস্তিত্ব সঙ্কটে ভুগছে, অন্যদিকে তেমনি এসব প্রতিষ্ঠান লগ্নিকৃত বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোটি কোটি টাকা আটকে যাবার আশংকা দেখা দিয়েছে।

ব্রাক কর্তৃপক্ষ সমাজ সেবামূলক প্রকল্পের বিষয়ে উচ্চকণ্ঠ হলেও তাদের প্রসারমান বাণিজ্যের বিষয়ে নিশ্চুপ। ক'দিন আগে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, সমাজকল্যাণের নামে ব্র্যাক দেশব্যাপী চামড়াজাত দ্রব্য, পাট, পোশাক শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প, হিমাগার এবং হস্তশিল্প ব্যবসা করছে। মহাখালীতে ৬ তলা ইমারাত নির্মাণ করে প্রিন্টিং প্রেস স্থাপন করেছে। বিভিন্ন স্থানে ৭০ একর জমি ক্রয় করেছে। ব্রাকের অজুহাত অনুদান-নির্ভরতা কাটানোর উদ্দেশ্যে তারা এসব অর্থকরী প্রকল্প চালাচ্ছে। কিন্তু এসব প্রকল্পে সেবার নামে বিভিন্ন সুবিধা নেয়ার বিষয়ে ব্র্যাক নিশ্চুপ। এ সুবিধা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের ক্ষতি করছে- এ বিষয়েও তাদের কোন প্রতিক্রিয়া নেই।

এই বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানটির কথাই ধরা যাক। যন্ত্রপাতি আমদানীর সময় তারা বিশেষ রেয়াত পেয়েছে। এ সংস্থা কম্পিউটার যন্ত্রপাতি, কেমিক্যাল, ফিল্ম এবং মুদ্রণ সামগ্রীসহ লাখ লাখ টাকার মালামাল আমদানী করেছে। যন্ত্রপাতি আমদানীর সময় যে সুবিধা পেয়েছে সে সুবিধা এখনো অব্যাহত। পাশাপাশি দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সেবার নামে আনা অনুদানের টাকায় এ মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত। পাশাপাশি দেশের মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানসমূহ যন্ত্রপাতি আমদানীসহ প্রতিক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী শুল্ক কর পরিশোধ করছে। ব্যাঙ্ক ঋণের টাকায় স্থাপিত এসব প্রতিষ্ঠানকে ব্যাংকের সুদ গুনতে হচ্ছে। এমন সুবিধাজনক অবস্থানে থেকে স্থানীয় ব্যবসায় ব্র্যাক প্রিন্টার্স যখন নাক গলায়,তখন দেশের মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলোর তাদের সাথে পাল্লা দেয়া অসম্ভব হয়ে পরে। একপেশে সুবিধা পেয়ে ব্র্যাক স্থানীয় শিল্পের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ালেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নীরব। এই নীরবতার মাশুল দিচ্ছে ব্যাংক ঋণের টাকায় গড়া দেশের মুদ্রণ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমুহ।

ব্র্যাকের আরেকটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আড়ং। এদের রয়েছে একাধিক বিলাসবহুল বিপণী। বিক্রয়যোগ্য সব পণ্যই দেশে উৎপাদিত। উৎপাদক মুখ্যত গ্রামীণ মহিলারা। অভিযোগ রয়েছে উৎপাদক পর্যায়ে প্রদত্ত পারিশ্রমিক এবং পণ্যের বিক্রয় মুল্য এ দুয়ের মধ্যে রয়েছে আকাশ পাতাল ফারাক। এই ফারাক হচ্ছে আড়ং-এর মুনাফালোভী চরিত্রের প্রকাশ। মূলধন এ প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ যোগান দেয় বলে যদি উৎপাদক পর্যায়ে এ নিম্নহার পরিশোধ করা হয়-তবে সেক্ষেত্রে তো সমাজ সেবার চেয়ে মহাজনী মনোভাবই প্রকটভাবে ফুটে উঠে। পাশাপাশি দেখা গেছে, সমমানের যে কোন বিপণী হতে একই পণ্যের মূল্য আড়ং-এ অনেক বেশী।

সম্প্রতি ব্র্যাক সরবরাহকারী হিসেবেও ব্যবসা করছে। ইতিমধ্যে তারা একটি প্রতিষ্ঠানে কাগজ সরবরাহ ব্যবসায় ও নেমেছে। কাগজের উৎপাদক নয়, এজেন্সীও নেই, প্রকৃত কাগজ ব্যবসায়ীও নয়-তারপরও তারা সরবরাহ ব্যবসায় নেমেছে। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের মতে, প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসা সুষ্ঠ প্রতিযোগিতার ভিত্তিতেই পরিচালিত হওয়া বাঞ্চনীয়। অন্যথায় দেশীয় ব্যবসায়ীরাও বাধ্য হবে স্বেচ্ছাসেবী বা সেবামূলক সংস্থার

আলখেল্লা গায়ে জড়িয়ে ব্যবসায় নামতে। সে ক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্যে যেমন নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে তেমনি সরকারও বঞ্চিত হবে রাজস্ব হতে।”